অ্যালঝাইমার্স: যে জন আছে মাঝখানে

সীমন্তিনী মুখোপাধ্যায়

একদিন সকালে গ্রেগর সামসা ঘুম ভেঙে উঠে দেখে, সে রূপান্তরিত হয়েছে এক অতিকায়, বীভৎস কীটে। বদলে গিয়েছে তার কণ্ঠস্বর, জড়িয়ে গিয়েছে উচ্চারণ। ছোটো ছোটো অসংখ্য কিলবিলে পা আর বিরাট ভারী খোলস নিয়ে বিছানা থেকে নামার কায়দাটাও তার জানা নেই। পরিবারে সে-ই এক মাত্র রোজগেরে। কাজে পৌঁছোতে দেরি দেখে বাড়িতে খবর নিতে এসেছেন ম্যানেজার। গ্রেগর দরজা খুলছে না কিছুতেই। তাতে ভয়ংকর উদ্‌বিগ্ন তার বয়স্ক বাবা-মা, আদরের ছোটো বোন। ফ্রান্জ কাফকার বহুপঠিত গল্প 'মেটামরফোসিস'-এর শুরুটা এ রকমই। এর পরের ৪০টি পাতায় কাফকা-সুলভ নিস্পৃহতায় উঠে আসে গ্রেগরের রূপান্তরের সঙ্গে তার এবং তার পরিবারের যুঝে ওঠার খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন, 'মেটামরফোসিস' আসলে গ্রেগরের চেয়েও বেশি করে তার বোন গ্রেটার রূপান্তরের গল্প, গ্রেগরের দেখাশোনা করার দায়িত্ব যে স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিল নিজের কাঁধে। দাদার জন্য দুশ্চিন্তায়, উদ্‌বেগে বিনিদ্র রাত কাটায় গ্রেটা। সকালে দুধের বাটি অনাস্বাদিত দেখে পুরোনো খবরের কাগজের ওপরে সে-ই এনে দেয় গত রাতের উচ্ছিষ্ট, পচা খাবার। তার সামনে এসব খেতে গ্রেগর লজ্জা পেতে পারে ভেবে সে বেরিয়ে যায় ঘরের দরজা টেনে দিয়ে। গল্প যত এগোয় ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসে গ্রেগরের জন্য তার উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা। এসে পড়ে বিরক্তি, হতাশা, এবং এই পরিণতিহীন যাপন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। গ্রেগরের কাছেও অসহ্য হয়ে ওঠে তার সেবা। সে ভাবে, 'স্পষ্ট করে যদি ওকে ধন্যবাদ দিতে পারতাম, জানাতে পারতাম ওর প্রতি আমি কতটা কৃতজ্ঞ, তবে হয়তো একটু স্বস্তি পেতাম!' গ্রেগর যে একজন অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ, তার পরিবর্তনটুকু যে কেবলমাত্র শারীরিক, সেই সম্ভাবনা স্থান পায় না তার পরিবারের কারোর মনেই। বাবার চরিত্রে সংবেদনশীলতা আগা-গোড়াই কম, রূপান্তরিত গ্রেগরকে তিনি প্রথম থেকেই ঘৃণার চোখে দেখেন। এমনকী তাকে মারধোর করতেও তাঁর আটকায় না। ছেলের এই করুণ পরিণতিতে মর্মাহত মা, কিন্তু পরিণত অবস্থায় সে কেমন, আগের মতোই সে ভাবতে পারে কি না, তা জানতে চান না একবারও। গল্পের শেষ দিকে গ্রেটা বলে, 'এই পোকাটা কিছুতেই আমার দাদা নয়। দাদা হলে কবেই নিজের থেকে চলে যেত। ও বুঝত যে এরকম একটা জন্তুর সঙ্গে কোনো মানুষ এক পরিবারে থাকতে পারে না।'

যে-বছর 'মেটামরফোসিস' লেখেন কাফকা, সেই বছরেই জার্মানির রুর অঞ্চলে জন্ম হয় অ্যানা লেঙ্কারিং-এর। চার বছর বয়সে অতিরিক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে সে। রাত্রে কাঁপুনি হয়, ধরা পড়ে স্নায়ুর সমস্যা। এমনিতে শান্ত, মিষ্টি স্বভাবের অ্যানার স্কুলের পড়া বুঝতে অসুবিধে হয়। আজকের পরিভাষায় তাকে বলা হত 'বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন শিশু'। বড়ো হয়ে নার্সারির শিশুদের দেখভাল করবে, এই ছিল তার স্বপ্ন। ১৯ বছর বয়সে আদালতের অনুমতিতে তার মা এক হাসপাতালে তার বন্ধ্যাত্বকরণ করান। এর পাঁচ বছর পর তার মৃত্যু হয়। ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা ছিল, মৃত্যুর কারণ পেরিটোনাইটিস। উত্তরকালের গবেষণা অনুযায়ী অবশ্য অ্যানার সেই ডেথ সার্টিফিকেট পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম কলঙ্কিত অধ্যায়ের স্বাক্ষর বহন করে। অ্যানার ভাইঝি সিগরিড ফ্যাল্কেনস্টাইনের গবেষণা দেখিয়েছে জার্মানির গ্র্যাফানেক ইউথেনেশিয়া সেন্টারের গ্যাস চেম্বারে মৃত্যু হয় তার। শারীরিক প্রতিবন্ধীকতা, মানসিকভাবে অশক্ত, বার্ধক্যজনিত বা দূরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন যাঁরা— অর্থাৎ যাঁরা খাপে খাপে মেলেন না 'সুস্থতা' এবং 'স্বাভাবিকত্ব'-এর মডেলটির সঙ্গে, শ্রমের বাজারে যাঁরা মূল্য হারিয়েছেন বলে ধরে নেওয়া যায়, তাঁদের সরিয়ে দিতে হবে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার বুক থেকে, এই যুক্তিতেই কাজ করত হিটলারের 'অ্যাকসিয়ন টি-ফোর' প্রোগ্রাম। একটি হিসাব অনুযায়ী নাৎসি জমানায় অ্যানার মতো আড়াই লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলা হয় এই প্রকল্পটির আওতায়। নিজের গবেষণায় যতটুকু তথ্য উদ্ধার করতে পেরেছেন, অ্যানাকে লেখা একগুচ্ছ চিঠির মধ্যে তা সাজিয়েছেন সিগরিড। ক্ষমতার পূজারি এবং

পৈশাচিক ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রশক্তি মুছে দিতে চেয়েছিল যে নাম, পরিচিতি, আর সম্ভ্রম, চিঠির গুচ্ছে তা-ই তাঁকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁরই এক উত্তরাধিকারী।

প্রশ্ন উঠতে পারে, রণবীর সমাদ্দারের Krishna : Living With Alzheimer's বইটির সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রেগর সামসা বা অ্যানা লেঙ্কারিংয়ের প্রসঙ্গের অবতারণা কেন? আসলে এই বইটি শুধুমাত্র অ্যলঝাইমার্সের মতো একটি জটিল অসুখের সঙ্গে দিনযাপনের খুঁটিনাটি বিবরণ তুলে ধরার কাজটি সমাধা করে না (সেই কাজটির গুরুত্বই যে অপরিসীম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না), তার পাশাপাশি ছুড়ে দেয় আধুনিক সমাজচর্চায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি বৃহত্তর প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই হয়তো আবিষ্কার করা যায় হিটলারের 'অ্যাকসিয়ন টি-ফোর' অথবা গ্রেগর সামসার প্রতি ব্যবহারে তার পরিবারের 'মেটামরফোসিস'-এর ভিত্তি। প্রশ্নটি, রণবীরবাবুর ভাষায়, 'the curse of biologism' -এর। সহজ করে বললে, biologism-এর তত্ত্বে বিশ্বাসী মনে করেন শারীরিক সক্ষমতার মাপকাঠিতেই ধার্য হয় জীবনের মূল্য। বইটি দেখায় শুশ্রূষা বা care-এ নৈতিকতার প্রশ্নটিও কীভাবে biologism-এর ধারণার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। রণবীর সমাদ্দার এ সময়ের অন্যতম সমাজ-বিজ্ঞানী। বিষয়, রচনাশৈলীর নিরিখে তাঁর অজস্র লেখালেখির মধ্যে এই বইটি নিঃসন্দেহে অন্যরকম। সংক্ষিপ্ত ভূমিকার গোড়াতেই লেখক বলেন, বইটি একজন অ্যালাঝাইমার্সের রোগীর লড়াইয়ের বৃত্তান্ত। খানিক শ্লেষের সঙ্গে বলেন, লড়াই শুধু রোগের সঙ্গে নয়, চিকিৎসাব্যবস্থার সঙ্গেও— যে ব্যবস্থায় স্বমহিমায় জ্বলজ্বল করছেন পেশাদার বিশেষজ্ঞেরা।

১৯৮১ সালে বিয়ে করেন রণবীর সমাদ্দার এবং কৃষ্ণা ভট্টাচার্য। গোড়া থেকেই দু-জনে বুঝতেন তাঁদের বড়ো হওয়ায়, জীবনবোধে এবং আচরণে বিস্তর প্রভেদ। সেই প্রভেদগুলিকে বুঝতে বুঝতে এবং সম্মান দিতে দিতেই পরস্পরের কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠেন তাঁরা। রণবীর সুখ্যাত পণ্ডিত, পেশায় অধ্যাপক কৃষ্ণা ইন্ডোলজিতে পিএইচডি। তাঁরা নিঃসন্তান— তা নিয়ে দু-পক্ষের আত্মীয়স্বজনদের তির্যক মন্তব্য রণবীর গায়ে না মাখলেও ভেঙে পড়তেন কৃষ্ণা। কৃষ্ণা সন্তান চাইতেন। বলতেন, 'আমি ভালো করে সংসার করতে চাই।' ২০০১-এ পেশাগত কারণে কলকাতা ছেড়ে কাঠমান্ডু চলে যেতে হয় রণবীরকে। চাকরির কারণে কলকাতায় থাকতে বাধ্য হন কৃষ্ণা। একাকিত্বে, অবসাদে ডুবে যান তিনি। আগ্রহ হারাতে থাকেন রান্না করা বা খাওয়ার মতো দৈনন্দিন কাজে। অল্প ক-দিনের জন্য স্বামী কলকাতায় এলে বা তিনি কাঠমান্ডু গেলেও আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবে অবসন্ন হয়ে পড়তেন। তখনই হারাতে শুরু করে তাঁর স্মৃতি। হয়তো মানিব্যাগটা হারিয়ে ফেললেন, বা ভাবলেন হারিয়ে ফেলেছেন, চাবির গোছা থেকে ঠিক চাবিটা বের করতে পারছেন না, কলেজের কাজে বার বার ভুল হয়ে যাচ্ছে। স্মৃতি যত হারাতে থাকে ততই বেড়ে চলে স্বামীর প্রতি নির্ভরতা— প্রতি মুহূর্তে পাশে চান তাঁকে। রণবীর বুঝতে পারেন এরপর থেকেই শুশ্রূষাই তাঁর জীবনধারা হতে চলেছে, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তাঁকে যুঝতে হবে এক চিকিৎসাহীন জটিল ব্যাধির সঙ্গে। তিনি বোঝেন, অ্যালঝাইমার্স এমনই এক ট্রাজেডি, যা কোনো বাঁধাধরা ছক মেনে এগোয় না। একেক জন মানুষের ক্ষেত্রে তার গতিপথ একেক রকম। চেতন এবং অচেতনের মাঝখানে যে আলো-আঁধারির জগৎ, অ্যালঝাইমার্সের রোগীর বিচরণ সেখানে। সেখানে অনুভূতি আছে, ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে, নিজের পরিবর্তনটাকে বোঝার চেষ্টা আছে, আছে রোগের সঙ্গে লড়াই আর আপোশ। সচেতন শুশ্রূষার ভূমিকার মূল্য সেখানে অপরিসীম। অথচ পেশাদার চিকিৎসকের একাংশ এগুলিকে তেমনভাবে গুরুত্ব দেন না। অসুখটি যেখানে পরিভাষাগতভাবে এক, প্রতিটি রোগীর চিকিৎসাও তাঁদের কাছে এক। রণবীর কাঠমান্ডুর কাজ পাকাপাকিভাবে ছেড়ে এলেও পেশাগত কারণে প্রায়ই বাইরে যেতে হত তাঁকে। ২০০৬ সালে একবার দিন দশেকের জন্য বিদেশে যান তিনি। কৃষ্ণা তখনও চেকে সই করতে পারতেন, খবরের কাগজ পড়তে পারতেন, এমনকী নিজের হাতে খেতেও পারতেন। তবে শেষ গ্রাসটা নিয়ে কী করতে হবে বুঝতে পারতেন না অনেকসময়ে। প্রতিদিন অন্তত একবার ফোন করতেন রণবীর। কৃষ্ণা বার বার জানতে চাইতেন কবে তিনি ফিরে আসবেন। ফোন রাখার পরেই আর কিছুতেই মনে পড়ত না তারিখটা। বাড়ি ফিরে রণবীর দেখেন কৃষ্ণার ঘরের বাইরে দেওয়ালে কাঁপা-কাঁপা হাতে পেন্সিলে লেখা, 'সাত তারিখে রণবীর ফিরিবে আসিবে। সাত তারিখে রণবীর ফিরিবে।' এরপরে কয়েক দিন ধরে তাঁকে তাড়া করে কয়েকটি প্রশ্ন। স্মৃতি আসলে কী? শারীরবৃত্তীয়, জৈবিক কিছু স্মৃতি কি অবিনশ্বর? কী সেই স্মৃতি, যা অ্যালঝাইমার্সের রোগীও হারিয়ে ফেলেন না, বহন করে চলেন আমৃত্যু? চেতন এবং অচেতন— এই দুই জগতের মধ্যেকার সাঁকো কি ওই এলোমেলো হস্তাক্ষর? তাঁর মনে হয়, এই পথটুকুতে একটু আলো ফেলতে না পারলে অ্যালঝাইমার্সের রোগীদের যথার্থ শুশ্রূষা দেওয়া সম্ভব নয়।

ভালোবাসার মানুষটি বদলে যাচ্ছেন, ক্রমশ হারিয়ে ফেলছেন প্রাত্যহিক কাজের ক্ষমতা, ভুলে যাচ্ছেন তিনি কে, সঙ্গের মানুষটি কে। তবে তিনি জানেন পাশে থাকা মানুষটির উপস্থিতি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। তাই কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেও হয়তো সেই মানুষটির ডাকে

সাড়া দেন। রণবীর তখন কৃষ্ণার কাছে 'দাদা'। দৈনন্দিন সাধারণ কোনো কাজও সাহায্য ছাড়া করতে পারেন না। বদলে যাওয়া মানুষটিকে ভালোবেসে, তাঁর স্বতন্ত্র ব্যাক্তিত্বকে সম্মান দিয়ে রণবীর বুঝতে চান কীসে তিনি ভালো থাকবেন, খুশি থাকবেন। দিনযাপনের খুঁটিনাটি বিবরণে এই বই দেখায়, কীভাবে একজন অ্যালঝাইমার্সের রোগীও খুশি থাকতে পারেন, হেসে উঠতে পারেন পছন্দের কিছু ঘটলে। অথচ বন্ধু এবং পরিজনদের অধিকাংশই সেকথা বোঝেন না। কেউ রণবীরকে ভালোবেসে, কেউ-বা নিছক কৌতূহল মেটাতে জিজ্ঞাসা করেন, কৃষ্ণা কেমন আছেন? প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে তাঁকে বাড়ি ফিরতে হয় কেন? নিজের যথেষ্ট খেয়াল রাখছেন তো তিনি? এ রোগ যে কোনোদিন সারবে না তা কি তিনি জানেন? ডাক্তাররা কি বলছেন? রণবীর বোঝেন, আসলে তাঁরা জানতে চান, 'তুমি কী বুঝতে পারছ যে আর কিছু করার নেই?'... যেন সুস্থতা এবং সক্ষমতার চেনা ছক থেকে একবার বেরিয়ে গেলে, বিশেষত সেখানে আর ফিরে আসার সম্ভাবনা না থাকলে মৃত্যুর প্রতীক্ষাই মানুষের একমাত্র করণীয়। অ্যালঝাইমার্সের রোগী তাই খুশি থাকতে পারেন না, অন্তত সেই খুশি থাকার কোনো মূল্য নেই, কারণ তা গড়পরতা সুস্থ এবং সবল মানুষের খুশির ধারণার সঙ্গে মেলে না। এমনকী চিকিৎসাবিভ্রাটে কৃষ্ণার মৃত্যুর পরেও শুভানুধ্যায়ীরা এসে সান্ত্বনার সুরে বলেন, 'যা হয়েছে তা ভালোই হয়েছে, কষ্ট পাচ্ছিলেন।' কৃষ্ণা যে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তা যেন স্বতঃসিদ্ধ। রণবীর শুধরে দেন, 'কৃষ্ণা আমাদের মধ্যে খুশি ছিল। ওর ঠোঁটে একটা হাসি লেগে থাকত। আমরা ওকে কষ্ট পেতে দিইনি, অন্তত খুব বেশি না।' বন্ধু বলেন, 'তবু এভাবে বেঁচে থাকার কী মানে বলুন? ঠিক করে খেতে পারতেন না, কথা বলতে পারতেন না, হাঁটতে পারতেন না!' পেশাদার চিকিৎসকদের আচরণেও দেখা যায় সংবেদনশীলতার একইরকম অভাব। গ্রেগর সামসা বা অ্যানা লেক্কারিং-এর ঘটনা আপাতভাবে অনেক বেশি অমানবিক। কিন্তু এ বই পড়লে মনে হয় সুস্থতার চেনা ছক থেকে কোনোরকম বিচ্যুতি সম্পর্কে সমাজের অবস্থান বড়ো-একটা বদলায়নি আজও।

অ্যালাঝাইমার্সে শুশ্রূষার গুরুত্ব অনেক আধুনিক গবেষণায় উঠে এলেও কৃষ্ণার চিকিৎসকেরা তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি। রণবীর বুঝেছিলেন, কৃষ্ণার শুশ্রূষা পুরোমাত্রায় কার্যকর হবে যদি শুশ্রূষাকারীরা (caregiver) নিজেরা একটা টিম হয়ে উঠতে পারেন। দিনের বেলা দুজন এবং রাত্রে দুজন তাঁর দেখাশোনা করতেন। এই ব্যয়সাপেক্ষ বন্দোবস্তটি বজায় রাখতে অন্যান্য অনেক খরচ কমিয়ে ফেলতে বা বন্ধ করে দিতে হলেও রণবীর বুঝেছিলেন কৃষ্ণাকে ভালো রাখতে গেলে এটাই দরকার। এই শুশ্রূষাকারীরা কেউ প্রথাগত শিক্ষায় তেমন শিক্ষিত না হলেও কৃষ্ণার প্রয়োজনগুলো অনেকটাই বুঝে গিয়েছিলেন— হাসপাতালের প্রশিক্ষিত অথচ উদাসীন চিকিৎসাকর্মীরা যে কাজটি পারেননি, বা পারতে চাননি।

গড় আয়ুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ (অ্যালঝাইমার্স যার একটি অন্যতম প্রধান কারণ), উন্নত দেশগুলির পাশাপাশি ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশেও। একটি হিসাব অনুযায়ী ভারতে ৪০ লক্ষেরও বেশি মানুষ ডিমেনশিয়ায় ভুগছেন। ২০৩০-এ শুধুমাত্র অ্যালঝাইমার্সের রোগীর সংখ্যাটাই দাঁড়াবে ৭৫ লক্ষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং অ্যালাঝাইমার্স ডিজিজ ইন্টারন্যাশনাল ২০১২ সালের একটি রিপোর্টে ঘোষণা করে, স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত জননীতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দাবি করে ডিমেনশিয়া। সেই রিপোর্টে দেখানো হয়েছে শুশ্রূষাকারী নিজেই কীভাবে অনেকসময়ে মানসিক অবসাদের শিকার হয়ে পড়েন। অসুখটিকে বুঝতে না পারা, হতাশা, লোকলজ্জা, বা আটকে পড়ার ভয় থেকে তৈরি হয় নানান জটিলতা। ভারতের মতো দেশে এই দুরারোগ্য, জটিল ব্যাধির সঙ্গে অসম সংগ্রামে নামতে হয় রোগীর পরিবারকে। এ দেশে এই অসুখগুলি এখনও স্বাস্থ্য বিমার আওতার বাইরে। স্বাস্থ্য পরিষেবার অপ্রতুলতা এবং জনস্বাস্থ্যনীতির সীমাবদ্ধতার কথা উঠে এসেছে ওই রিপোর্টে। বলা হয়েছে সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির কথা। রীতিমতো ছক কষে দেখানো হয়েছে ছ-টি ধাপে গ্রহণ করতে হবে ডিমেনশিয়াকে— শুশ্রূষাকারীর সাহায্য থেকে এনজিওদের ভূমিকা, দেশের আইনি কাঠামোয় সংস্কার, চিকিৎসকের জন্য নির্দেশাবলি, ছকে বেঁধে ফেলা হয়েছে সমস্ত 'stakeholder'-কে'! যেমনটা করা হয়ে থাকে এই ধরনের সমস্ত রিপোর্টে। অসুখটাকে সত্যি সত্যি বুঝতে গেলে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধনীতি তৈরি করতে গেলে কিন্তু পড়তেই হবে রণবীর সমাদ্দারের Krishna: Living With Alzheimer's অথবা জন বেইলির Iris: A Memoir of Iris Murdoch। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জন বেইলি তাঁর ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক স্ত্রী আইরিস মার্ডকের অ্যালঝাইমার্স-যাপন নিয়ে একটি বই লেখেন ১৯৯৮ সালে। 'কৃষ্ণা' লেখার ঠিক দশ বছর আগে এক বন্ধুর বাড়িতে বইটি হঠাৎ চোখে পড়ে রণবীরবাবুর।

ঋণ: অন্বেষা সেনগুপ্ত

কৃষ্ণা: লিভিং উইথ অ্যালঝাইমার্স, রণবীর সমাদ্দার, উইমেন আনলিমিটেড, ২০১৫